চতুর্থ অধ্যায়
কালকূটের রচনাবলীর মূল্যায়ন

কালকূটের রচনাবলীর বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা যায় তাঁর স্বনামের রচনাগুলির পাশে কালকূট নামাঙ্কিত রচনাগুলিতে দেখা যায় ভিন্ন ভাষাশৈলী, বাকভঙ্গি, ভিন্ন ভাবের প্রকাশ। আসলে কালকূট কখনই গতানুগতিক ভ্রমণ কাহিনি লিখতে চাননি। প্রায় প্রত্যেক লেখার শুরুতেই ভ্রমণের সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করে থাকেন। যেমন 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণ'-এ কালকূট তাঁর বেরিয়ে পড়ার কারণ স্বরূপ বলেছেন—

> ''লিখতে বসে সঙ্কোচ হলো, পাছে একে কেউ ভ্রমণ কাহিনির অহংকার বলে বোঝে। একে কী বলবো, তার সংজ্ঞা আমার জানা নেই। প্রাণের মাঝখানে আছে যেন এক রূপ রসিকের বাস। বলতে হয়, এ শুধু রূপের ক্ষুধা মেটাবার এক অতৃপ্ত অনুভূতির প্রকাশ। বিচিত্রের স্বাদ পাবার সাধ! ঘর ছাড়া, পথ চলা, করতালির শব্দ। আনন্দের একটু কাঁদন। ব্যথার একটু হাসি। এইটুকুই মাত্র।''[১]

কালকূটের এই রূপের সন্ধানই হলো তাঁর 'আত্মানুসন্ধান'। এই রূপ অরূপের মাঝখানটাতেই তিনি যেন দোলা খান। তাই পথের ধূলার ডাকে তাঁর ছুটে ছুটে বেরিয়ে পড়া। সে ডাক দূর-দূরান্তের নয়, সে ডাক নিতান্ত দৃশ্যান্তরের, নতুন বৈচিত্র্যের। লেখকের ভাষায়—

> ''যে প্রতিবেশীকে বছরের পর বছর দেখেও কোনোদিন চোখে পড়ে নি, পরিবেশের গুণে তার বিচিত্র রূপ দেখে আমাদের মন ভুলে যায়। কী কথা! হাজার দিন দেখেও যে মন ভোলে না, সে একদিন সব ভোলে। মন চিনি না। তাই তো বারে বারে রূপ দেখি।''[২]

তিনি স্বীকার করেন সেই শৈশব থেকেই 'নিশি ডাকের' হাতছানি দেখেছেন। যেন তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই এই অমোঘ আকর্ষণের ডাক তাঁকে নিরন্তর হাতছানি দিয়েছে। শৈশবের সুরথনাথই যেন লেখকের নানান লেখার ভিতর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে। যেমন—'কোথায় পাব তারে', 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে', 'হারায়ে সেই মানুষে', 'অতিথি'-র মতো লেখাগুলিতে। আবার ছোটদের

জন্য লেখা 'মোক্তার দাদুর কেতুবধে' স্মৃতির সরণি বেয়ে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ পরিসরে উঠে আসে সুরথের নিশি পাওয়া জীবনের বিচিত্র সব স্মৃতি কাহিনি। আমরা কিন্তু সমরেশ নামে রচিত উপন্যাসগুলির কাহিনির নির্মাণ কৌশলের মধ্যে এই 'নিশির ডাক' বা হাতছানিকে খুঁজে পাই না। বরং নিশির টানে কালকূটের লেখার মধ্যে স্থান-কালের বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়। যার বিশাল সীমানা অতীতের ইতিহাস পুরাণ এবং মহাভারতের যুগ পর্যন্ত। এখানে উল্লেখ করা চলে 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত—'পৃথা', 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি', 'অন্তিম প্রণয়', 'জ্যোর্তিময় শ্রীচৈতন্য' লেখাগুলি একেবারেই অন্য স্বাদের। প্রথাগত ভ্রমণ কাহিনির কোন সূত্র এখানে পাওয়া যায় না। বরং এই রচনাগুলির মধ্যে আমরা কালকূটের মানস ভ্রমণকে দেখতে পাই। লেখক বলেছেন যে 'যথার্থ ভ্রমণ কাহিনি'র সঠিক সংজ্ঞা নিয়ে কম বিতর্ক নেই। কিন্তু তাঁর মতে এই বিষয়টি পুরোপুরি রচয়িতার ভাবনার ওপরই ছেড়ে দেওয়া ভালো। তিনি ভ্রমণ স্থানগুলির ভূগোল আর ইতিহাসকে অতিক্রম করে যাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন তা হল মানুষ। তাঁর দর্শনে মননে প্রকাশ ভঙ্গিমায় এই মানুষেরই নানান 'অচিন সত্তা'কে আমরা দেখি।

> ''সব মানুষই একজন নন। আর একজন আছে তাঁর মধ্যে। একজন যিনি কাজ করেন বাঁচবার জন্যে। অর্থের জন্যে, গলদঘর্ম দিবানিশি। যিনি আহার মৈথুন সন্তান পালনের, মহৎ কর্তব্যে ব্যাপৃত প্রায় সর্বক্ষণ। এই জটিল সংসারে যাঁর অনেক সংশয়, ভয় প্রতি পদে পদে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিবাদ এইসব নিয়ে যে মানুষ, তাঁর মধ্যে আছেন আর একজন যিনি কবি, সাহিত্যিক, পাঠক, শিল্পী, গায়ক, ভাবুক। এককথায়, যিনি রসপিপাসু। হয়তো তিনি লেখেন না, লেখা পড়ে হাসেন কাঁদেন, মুগ্ধ হন। গায়ক নন, গান শুনে সুরের মাঝে হারিয়ে যান। মানুষের এই অনুভূতির তীব্রক্ষণে, সে বড় একলা এ একাকীত্বের বেদনা যত গভীর আনন্দ তেমনি তীব্র।''[৩]

কালকূটের পথ চলায় সেই পথচারী মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, কাহিনির মাত্রা পায়। সহানুভূতিশীল কালকূটের কল্পনা আর ছোট ছোট জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে সেই মনোময় মানুষের আত্ম-উন্মোচন ঘটতে থাকে। আমরা দেখি প্রকৃতির বিস্ময়- ভৌগোলিক পরিবর্তন ইতিহাসের

বিচিত্র ভাঙা-গড়ার ঘটনাকে আশ্রয় করে এবং অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে একটি কাহিনির আদল তিনি তৈরি করে ফেলেন। কালকূট যখন মানুষের অন্তর জগতের চিত্র আঁকেন সেই মুহূর্তে তিনি যেন কোন সামাজিক মানুষ নন। শিশুর মতো তাঁর অপার কৌতূহল মেশানো দৃষ্টি নিয়ে তিনি নিরপেক্ষ থেকে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা করে চলেন। ফলে শুধুমাত্র চরিত্র নয় কাহিনিও তাঁর অসাধারণ দক্ষতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কালকূট পথ চলতে চলতে ঠিক ধারা বিবরণী দেওয়ার মতো করে তাঁর রচনা রীতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। সেখানে কাহিনিকে খুব দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাড়া থাকে না বরং চরিত্রকে যথাযথভাবে তুলে ধরার দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক থাকে। তবুও এই চরিত্রায়ণের সমান্তরালেই চলতে থাকে কাহিনির বুনন। কালকূট তাঁর ভ্রমণ পরিক্রমায় দেখেছেন গ্রাম-পাহাড় প্রান্তীয় স্থানের মানুষজন অনেক বেশি অকপট সহজ আড়ালহীন। এদের সহজ জীবন-যাপন ভাবনা অনেক সময় কালকূটকে বিস্মিত করে। এই পরম বিস্ময়ের সামনে কালকূট সবসময় নতিস্বীকার করেছেন। এদের মধ্যেকার মানব মহত্ব তাঁর ভেতরের অন্ধকার দীনতাকে মুছে দিতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে মাঝে মাঝে লেখক নিজেই তাঁর নাগরিক মন নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়েছেন। এখানেই যেন কালকূটের স্রষ্টা ও চরিত্র দুটি পৃথক হয়ে যায়। উপন্যাসগুলিতে কালকূটের ভূমিকা সবসময় প্রায় কথকেরই থাকে। আর থাকে আপন চলন-বলন-বিবরণ। কিন্তু কালকূট চরিত্র আঁকার ক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা নয় বরং পরোক্ষ এবং অনেকটা গৌণ উপস্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়। কাহিনি বলতে বলতে যে চরিত্র পাঠককে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে। আবার কখনও পাঠকের সঙ্গেও কথোপকোথন চলে। কথকের সেই বয়ান কখনও হয়ে ওঠে গভীর মগ্নভাষণ, কখনও অকপট আত্মপ্রকাশ, কখনও থাকে মুগ্ধতা আবার কখনও শুধুই বর্ণনা। এবং এই ধরণের আলাদা আলাদা অবস্থান পরিবর্তন করার মধ্যে দিয়েই 'কথক চরিত্রের' বিভিন্ন অভিপ্রায়, তার চরিত্র হিসেবে স্পষ্ট অবস্থান এবং পরিচিতি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এবং ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে এই পরিচিতিই একটি অভিন্ন সত্তাকে চিনিয়ে দেয়। তবে বেশ কিছু উপন্যাসে আমরা কালকূট চরিত্রকে প্রায় পাই না বললেই চলে, সেগুলি তাঁর পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক রচনা।

একই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দিয়ে কালকূট ও সমরেশ এই দুই নামেই আমরা গল্প ও উপন্যাস পাই। যেমন তিনি সারেঙ্গা রেঞ্জে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমরেশ নামে লেখেন

'দুই অরণ্য' উপন্যাস এবং কয়েকটি গল্পও। 'অরণ্যনিশি' আর 'নির্বাসিতা' নামক দুটি গল্পে খুব স্পষ্ট ভাবেই সুরসতিয়া আর তৃপ্তি ভৌমিককে খুঁজে পাওয়া যায়। আবার এই একই প্রেক্ষাপট ও চরিত্রদের 'কালকূট'-এর ত্রয়ী অরণ্য উপন্যাসগুলিতেও দেখা যায়। কিন্তু যেটা উল্লেখ্য বিষয় তা হল লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে দুটি পৃথক আঙ্গিকে রচনা করেছেন। তাই তো প্রায় একই কাহিনি হওয়া সত্ত্বেও পুনরাবৃত্তি ঘটে নি বরং ছোটগল্প ও উপন্যাস তাদের সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপে উদ্ভাসিত। একই উপাদানের ব্যবহার হয়ে থাকলেও দুই ভিন্ন সত্তার রচনারীতি-উপস্থাপনা-বিশ্বাস-বয়নে এক বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যে'কটি শাখার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তার মধ্যে ভ্রমণ সাহিত্যও অন্যতম। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে আমাদের দেশে প্রথম রেলপথের প্রবর্তন হয় এবং যার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজ্য ও রাজ্যের নানা প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের ফলে ভ্রমণ পিয়াসীদের আর ইচ্ছে মতো বিচরণে কোন বাধা থাকে না। তাঁরা তাঁদের ভ্রমণের নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, ভাবনা-চিন্তাকে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হন। সাহিত্যের পাতায় মনোগ্রাহী ছোট বড় ভ্রমণ বিষয়ক বইও প্রকাশ পায়।[৪]

সুতরাং এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের জন্য রেলপথের অবদান কম নয়। ঠিক একই ভাবে কালকূটের লেখার মধ্যে দেখি ট্রেন একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাঁর লেখায় ট্রেন সবসময় একটি প্রতীক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে নাটকীয় পটভূমি তৈরি করেছে। ট্রেনেই কাহিনির সূত্রপাত। এই ট্রেন যাত্রা তাঁর কাহিনিতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়ে। এই ট্রেন যাত্রা তাঁর বিভিন্ন লেখায় পাই, যেমন—'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'আরব সাগরের জল লোনা', 'মিটে নাই তৃষ্ণা', 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়', 'পণ্যভূমে পুণ্যস্থান', 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে', 'নির্জন সৈকতে' প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। ট্রেনেই কাহিনির শুরুর দিকটা আমরা দেখতে পাই। এর একটা প্রধান কারণ তখনকার দিনে ট্রেনই ছিল প্রধান বাহন। আর বেশিরভাগ তীর্থ যাত্রীই দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। তাদের কাছে ট্রেনেই যাতায়াত করাটা বেশি সুবিধে জনক ছিল। অন্যদিকে দেখি, যে আলাপ পরিচয় ট্রেনে প্রথম ঘটছে তারই সূত্র ধরে পরবর্তী কাহিনি এগিয়ে যাচ্ছে। ট্রেন থেকে গন্তব্যে পৌঁছে দেখা যায় এই পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় আরো নূতন চরিত্র এবং তাদের গল্প। যেমন—'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'আরব সাগরের জল লোনা',

‘স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে’ ইত্যাদি উপন্যাসে তাই দেখা যায়। অন্যদিকে ‘অমাবস্যায় চাঁদের উদয়’ উপন্যাসটি আবার এক লক্ষ্যাভিমুখী। এতে অন্য কাহিনি বা চরিত্র বেশি জোড়া লাগেনি।

কালকূটের উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় বহু চরিত্রের সমাবেশ। তাঁর যাত্রাপথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অতি সাধারণ চরিত্ররা সব উঠে আসে তাদের সাধারণত্ব বজায় রেখে। জীবনে চলার পথে কালকূট বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রবৃত্তির মানুষকে দেখেন ও বোঝার চেষ্টা করেন তাঁর সহৃদয় মন নিয়ে। এমনকি স্মৃতি থেকেও কত মানুষ একের পর এক উজ্জ্বল রোমন্থনে পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ায়। কালকূটের লেখায় বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা তাদের বৈচিত্র্যময় রূপ নিয়ে উঠে এসেছে। বলা চলে বিচিত্র মানুষের এক চিত্রশালা কালকূটের রচনাবলী। দেখা যায় পথের প্রথম পরিচয়ের স্বাভাবিক সঙ্কোচ কেটে গেলে এক মানুষের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার হয় আরেক মানুষ। আর এই বহু বৈচিত্র্য দেখে লেখকেরও নিজের জীবনের অসহায়তা ও ক্ষুদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা থাকে। যেমন—‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ উপন্যাসের চরিত্র ‘হিদের মা’ যিনি ছেলে ও ছেলে বৌ দ্বারা পরিত্যাজ্য। একমাত্র ছেলের ব্যবহার ও তাচ্ছিল্য তাকে সংসার বিমুখ করেছে। তাই মেলায় সে একা এসেছে। কিন্তু সংসারের যন্ত্রণা তাকে জীবনবিমুখ করে নি। সে এই সংসার থেকে পাওয়ার আশা করে না বরং দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রতিদিন ভিক্ষে করে পাওয়া অর্থ সে সর্বশান্ত হয়ে উজার করে দেয় এক সাধু বাবার খাওয়ারের ব্যবস্থা করে দিয়ে। সাধু বাবার তৃপ্ত মুখ তার অতৃপ্ত মনে আনন্দ সুধা এনে দেয়। কালকূট বিস্মিত হন, সংসার যার জন্য কোনরকমের আনন্দ বরাদ্দ করে রাখেনি, পাওয়ার ভাণ্ডার যার শূন্য, সে এমনি করে চলার পথে ‘ দেওয়ার আনন্দে’ নিজের অস্তিত্বের কোন সার্থকতাকে খুঁজে পেতে চায়। ‘কোথায় পাব তারে’ উপন্যাসে যেমন ‘গাজী’ চরিত্র। সারাদিন সে ‘মুরশেদের নামের মজদুরি করে ফেরে। সংসারে স্ত্রী সন্তান, তাদের মুখে সে নিত্যদিনের দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারে না, কোনদিন তার খাওয়ার জোটে কিম্বা জোটে না। তবু ভাঙা চৌচির মুখটিতে অমলিন হাসির ঝিলিক সর্বক্ষণ। পথে গান শোনাতে গিয়ে আর মুরশেদের নামে ভিক্ষে করতে গিয়ে কত অপমান-অবহেলা যন্ত্রণা তার জোটে। কিন্তু এখানেই কালকূট বিস্মিত হন কী এক মনের শক্তিতে সে সব যন্ত্রণাকে ভুলেছে। আবার অরণ্যত্রয়ী উপন্যাসে দেখি বনজ চরিত্ররা যেমন—মাংরি, সোমারি, শুক্রম এরা তাদের বৈশিষ্ট্য জীবনযাপন-আচার-আচরণ নিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বরং প্রকৃতির বর্ণনার থেকেও

চরিত্ররা অনেক বেশি সাবলীল হয়ে ফুটে উঠেছে। মেলা পরিক্রমার উপন্যাসগুলির মধ্যে দেখা যায় সাধারণ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায় বিশেষের চরিত্রগুলিও সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। এদের জীবনের আর্তিকে নিখিল মানব আর্তির সঙ্গে এক করে দেখিয়েছেন। একই ভাবে কালকূটের বর্ণনা নৈপুণ্যে উচ্চশিক্ষিত, বিত্তবান চরিত্ররা অনুপুঙ্খ ভাবে বর্ণময় হয়ে উঠেছে। কালকূট তাঁর অসামান্য পারদর্শিতায় কলমের দু-একটি আঁচড়ে যেসমস্ত চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন 'মন চলো বনে' উপন্যাসের 'উইলিয়ম', 'মন-ভাসির টানে'-র 'বুড়ি নানী', 'পন্যভূমে পুন্যস্নান'-এর বালক 'পবননন্দন ঝা', 'নির্জন সৈকতে'-র বিদেশী কোম্পানীর এজেন্ট 'প্রণব', 'প্রেম নামে বন'-এর সীমা এমনি আরো অজস্র চরিত্র। যাদের গভীরে ডুব দিয়ে তিনি যে সমস্ত চিত্র আঁকেন সেই চিত্রের যেমন বৈচিত্র্য, তেমনই গভীরতা এবং ব্যাপকতা। আবার এমন চরিত্রও এঁকেছেন যাদের আছে ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবন কিন্তু সেই জীবনের কানায় কানায় শুধুই রিক্ততা। এমনই চরিত্র 'কোথায় পাব তারে' উপন্যাসের 'অচিনবাবু'। যিনি উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার। প্রথম জীবনে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন এবং একটি মেয়েকে ভালো বেসেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি হলেন তাঁর একদা প্রেমাস্পদের স্বামীর উপরওয়ালা। এবং সেই প্রণয়ীর সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মধ্যে গুমরে মরে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা। যে সম্পর্ক এবং সম্পর্ক জনিত যন্ত্রণার কোন শেষ নেই, সেটা তাঁকে দিনে দিনে কেবলই ক্লান্ত করে তুলেছে। তাই প্রথম জীবনের স্মৃতিতে ডুব দিতেই প্রতি বছর শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় তিনি ঘুরে আসেন। আবার দেখা যায় 'আরব সাগরের জল লোনা'-র চরিত্র রণো বা রণদেবকে আমাদের কাছে কালকূট অদ্ভুত আশ্চর্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। যাঁকে সারা বিশ্ব, বিখ্যাত প্রতিভাবান চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক নামে চেনে। যাঁর প্রতিভাকে সহ্য করে যেতে হয় প্রযোজকদের অপমান, তাচ্ছিল্য। তাঁর ভেতরের শিল্পী সত্তা কেবল গুমরে মরে। অনাগত কোন এক স্বর্ণালী দিনের কথা ভেবে নিজেকে যিনি সংহত করতে থাকেন। কালকূটের মনে হয় আরব সাগরের লোনা জলে তাঁর কান্নাও মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সেই যন্ত্রণার মধ্যেও মানবাত্মার প্রকাশের আর্তিকে দেখান মানুষের বাহ্যিক আবরণের মধ্যে যে এক অন্য মানুষ লুকিয়ে থাকে, তাকে আবিষ্কার করে 'কালকূট' যেন আমাদের জীবনের মহত্তর সত্যের দিকটিকে দেখিয়ে দেন। এমনই এক চরিত্র 'চলো মন রূপনগরে'-র অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি একজন গ্রাম্য মানুষ হয়েও এক আধুনিক মনস্ক

মানুষ। যিনি যামিনী রায়ের ভক্ত, রবীন্দ্রসঙ্গ ধন্য মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যকার জীবনলীলা দেখে বেড়ান। কালকূটের নাম শোনা মাত্র তিনি চিনতে পারেন আবার গীতা মুখস্থ শুনিয়ে দেন। দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতি এই দুটির মধ্যে তিনি শ্রুতিকেই বেছে নিতে চান। অখ্যাত এক গ্রামে এমন এক মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে কালকূটের সঙ্গে আমরাও অবাক হই। আরেকটি চরিত্র 'ধ্যান জ্ঞান প্রেম' নামক উপন্যাসের বিজ্ঞানী ডি. কে. ঘোষ বা অমিত মৈত্র। যিনি বিজ্ঞানী আবার আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধানী। এই চরিত্রটি পাঠকের সামনে বিস্ময় সৃষ্টি করে, কারণ তিনি বৈজ্ঞানিক কবিতা ও অঙ্কের সমানতার কথা বলেন। তাঁর কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই কবিতা কিংবা অংক। বাইরের লোকের কাছে এই মানুষটি ভারসাম্যহীন বলে মনে হলেও কালকূট লক্ষ করেছেন এক অনন্য ভারসাম্যকে যা মানুষকে সৃষ্টির পথে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। কালকূটের উপন্যাসগুলির মধ্যে এমন কিছু চরিত্র কালকূট এঁকেছেন যারা পাঠকের হাসির খোরাক জুগিয়েছে। খুব সাধারণ ঘটনার মধ্যেই সেই হাস্যরসের উপাদানকে কালকূট আবিষ্কার করেন। যেমন—'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-র প্রহ্লাদের 'দিদিমা' এবং 'ডাক্তার পাঁচু গোপাল চরিত্র', 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'র 'পরমেশবাবু', 'কোথায় পাব তারে'-র 'ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী' ও 'নারায়ণ ঠাকুর', 'আরব সাগরের জল লোনা'-র, 'মিসেস গোমেজ', 'মিটে নাই তৃষ্ণা'-র 'পুরন্দর', 'নির্জন সৈকতে'-র ' খেকিয়ানন্দ', 'মন চল বনে'-র 'গাঙ্গুলিমশাই' —এঁরা প্রত্যেকেই এই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল চরিত্র।

কালকূট চরিত্রের সঙ্গে আমরা দেখি বিভিন্ন স্থানের চরিত্রদের সংযোগে তিনি আঞ্চলিক ভাষাকে সংলাপ নির্মাণের দিক দিয়ে প্রাথমিকভাবে প্রয়োগ করেন। আবার কখনও পাঠকের সুবিধের জন্য তাঁর বয়ানের মধ্য দিয়ে বা কথাসূত্রে শব্দের অর্থ বলে দেন। আবার কখনও নাগরিক সত্তা রূপে কালকূটকে দূরে সরিয়ে রেখে তার বয়ানে মিশিয়ে দিয়েছেন আঞ্চলিক ভাষা। এছাড়া তাঁর কথনে বাউল গানের পদ কখনো, বৈষ্ণব পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের গান এবং আরো অন্যান্য ভাষান্তরকে বলার মধ্যে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে এক অন্যমাত্রা দিয়েছেন। গল্প চলতে চলতে কোনো একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে কালকূট তাঁর নিকটবর্তী চরিত্রটির বাচন নিজের বয়ানে তুলে ধরেন, ফলে সেখানে যোগ হয় অতিরিক্ত তাৎপর্য। আবার কখনও কোনো প্রাকৃতজনের মুখের অপভাষাকে ব্যবহার করার সময় অর্থ তাৎপর্য বদলে নিয়ে পরিহাসও করে ফেলেন। কোথাও তাঁর লঘু কৌতুক বা রসিকতা পাঠককে

হাসিয়ে ছাড়ে।

''ভগবান জানেন, কী খেয়ে ওঁর গতরখানি অমন ভয়াবহ হয়েছে। আমি বেঁকে রইলাম একটা চ্যাপটানো ব্যাগের মতো।''[৫]

কখনও—''আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এক বৃদ্ধ। কলকাতা থেকেই যিনি বৈশাখের দাবদাহর শ্রাদ্ধ করেছেন অনেকবার। রেল কোম্পানীর পিণ্ডি চটকেছেন সহস্রবার, কারণ ওঁর মতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাখা নাকি অত্যন্ত কম ছিল।''[৬]

আবার —''মনে হলো, সারা গা-টা পাথুরে উঁচু-নিচু রাস্তার মতো হয়ে উঠেছে মশার কামড়ে।''[৭] কালকূট সাহিত্যে এমনি আরও লঘু হাস্য পরিহাসের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

উপন্যাসগুলির শুরুতে দেখা যায় কালকূট চরিত্র পাঠকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভিন্ন ভাষান্তরে যাতায়াত করে থাকেন। অত্যন্ত সামান্য বিষয় বা ঘটনাকে কথা বলার ধরণ হিসেবে ব্যবহার করার ফলে প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে নিয়ে বিচ্যুতি ঘটলেও দেখা যায় আন্তরিক সহজতা। এভাবে কথা বলতে বলতে তিনি নিজেকে কখনো প্রশ্ন করেন কখনো বা ব্যঙ্গ।

কালকূটের লেখায় আরেকটি জিনিস দেখা যায় তিনি ভ্রমণ পথে তাঁর পাশের লোকেদের সঙ্গে আলাপের সূত্রে বেশ আকর্ষণীয় এবং আগ্রহ ভাজন হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে মেয়েরা তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য কামনা করে। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' থেকেই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। মূলত কালকূটের অভিজ্ঞতায় প্রেমের মূল একটি রূপরেখা এবং তা উপস্থাপনার একটা ধরণ রয়েছে। নারীর প্রতি তাঁর অপার বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সূত্র ধরেই নানাভাবে আসে প্রেমের প্রসঙ্গ। তাঁর ক্ষেত্রে এই প্রেম ভাবনার উৎসব আর উপলব্ধির ক্ষেত্রে নারীই মূল কারক, পথ প্রদর্শক, ও গুরু। তাই এই 'প্রেম' বিষয়কে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি লেখার ভিতরেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তিনি কোথাও শ্রোতার ভূমিকায়, কোথাও দর্শক এবং কোথাও প্রেমের অন্যতম কুশীলব তিনিই। অথচ প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় অরণ্য প্রেক্ষাপটে রচিত উপ্যাসগুলির মধ্যে। যেখানে দেখা যায় অপ্রাপ্তি নারী চরিত্রটির পাশাপাশি কালকূটকেও সমানভাবে আলোড়িত করেছে। তৃপ্তি, সুরসতিয়ার মধ্যে তিনি হয়তো বা প্রেম ভাবনার বিশেষ কোনো তাৎপর্য খুঁজে পান। উপস্থাপনার দিক থেকে এর ব্যাপ্তি বহু মাত্রিক।

মানুষের বিচিত্র রূপ যেমন কালকূটকে হাতছানি দেয় তেমনি প্রকৃতির হাতছানিকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই তাঁর চোখ জোড়া যেন প্রকৃতির চির সবুজে কখনও কখনও তাই ডুব দিতে চায়। তাঁর বর্ণনা নৈপুণ্যে প্রকৃতির রূপে আমরাও মুগ্ধ হয়ে উঠি। কালকূটের ভাষায়—

''চোখের সব থেকে বড় ক্ষুধা বোধ হয় সবুজ বর্ণ।''[৮] আবার—

> ''বিলিতি ফুল গাছগুলোর তেমন যত্ন নেই। তবু তারা ফুটেছে অজস্র। আমি এদের নাম জানিনে, বর্ণবাহারেই মুগ্ধ। এত রঙ! একটি ছোট্ট ফুলের বুকে এত বিচিত্র রকমারি রঙ কেমন করে ফোটে! কী আছে মাটির রসে, কী আছে সূর্য কিরণে, গাছের প্রাণে প্রাণে ডুব দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।''[৯]

মানুষ ও প্রকৃতি এই দুয়েরই বিচিত্র রূপের মধ্যে কালকূট এক আনন্দের নিবিড়তা ও হৃদয়ের ব্যাকুলতা অনুভব করেন। যেন এই সকল কিছুর মধ্যে কোথাও কিছু একটা মিশে আছে, মনে করেন—

> ''পৃথিবীতে কোন কিছুই একক মহানুভবতায় মহীয়ান হয়ে উঠতে পারে না। মানুষ এবং প্রকৃতি, কিছুই নয়। ন'জনের মহানুভবতার যোগ ফল, দশমকে মহীয়ান করে তোলে। একজনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। হিমালয়ের এই বিচিত্র সৌন্দর্যকে প্রকৃতির অপরূপ রূপ মিলে-মিশে মহীয়ান করেছে।''[১০]

মানুষ ও প্রকৃতি এই দুই ক্ষেত্রেই শিল্পী তাঁর অনুভবের গভীরতার মধ্য দিয়ে মহানুভব সত্ত্বাকে বারবার দেখাতে চেয়েছেন। অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কালকূটের রচনারীতি অতি মনোগ্রাহী যেমন—উপমা উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করেছেন—

''কয়েক হ্যাঁচকাতেই এক্সপ্রেসখানি গজলের দ্রুত লয়ের মতো বাংলাদেশ পেরিয়ে গেল।''[১১]

''অন্ধকারের বুকে অজস্র আলোর সারি যেন কচি শিশুর হাসকুটে চোখের মত।''[১২]

''যেন খাঁচার পাখি খাঁচাছাড়া হয়েছে।''[১৩]

''স্মৃতি যেন কণ্ঠমালা প্রেয়সী।''[১৪]

রসিকতা পরিতৃপ্তির মাঝেই একটি বেদনাবহ অভিজ্ঞতাকে কালকূট শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্য দিয়ে লিখেছেন বলতে চান সুখের অত্যন্ত কাছে ওৎ পেতে আছে এক শিকারী বেড়াল। এক ২৮ বছরের যক্ষারোগীর যাতনা ও মৃত্যুকে বোঝাতে উপমার ব্যবহার দেখি—

''ফৌজ নেই দরজায়, বিনা বাধায় ঢুকছে সব বেনো জলের মতো।''[১৫]

''প্রায় কুড়িখানেক মাথার উপর মাথা। অন্ধকূল হত্যার জীবন্ত ছবি।''[১৬]

''তীরের মতো ছুটে এলো কয়েক জোড়া আধ-ঘুমন্ত চোখের বিরক্ত সন্দেহান্বিত দৃষ্টি।''[১৭]

''শত হলেও পশ্চিমদেশ। ভোরের আলোয় যাকে দেখেছিলাম শ্যামাঙ্গিনী, রৌদ্রালোকে দেখলাম শ্যামাঙ্গিনী কিঞ্চিৎ রুক্ষ।''[১৮]

''ঝিকমিকিয়ে উঠলো অশ্রুর মুক্তাবিন্দু।''[১৯]

''একটা অন্ধ ক্ষিপ্ত মোষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম।''[২০]

পূর্ণ উপমা—''আলোর ঝলক গঙ্গার পূর্বতীরের বাঁকা স্রোতে শাণিত বঙ্কিম অস্ত্রের মতো ঝিকমিকিয়ে উঠেছে।''[২১]

সমাসোক্তির ব্যবহার—

''তাঁর দক্ষিণী সমুদ্রের অতল ডাগর চোখে ঝিকমিকিয়ে উঠলো অশ্রুর মুক্তাবিন্দু। সপ্তরশ্মি খেলে গেল তাঁর ... কানে পরা... পাথর খচিত কর্ণভূষণে। ক্লান্ত কালনাগিনীর মতো পিঠের উপর এলিয়ে পড়ে রইলো রুক্ষ বেণী।''[২২]

''তারই আলোর ঝলক গঙ্গার পূর্বতীরের বাঁকা স্রোতে শাণিত বঙ্কিম অস্ত্রের মতো ঝিকমিকিয়ে উঠেছে।''[২৩]

রূপক— ''জল আমাদের দুঃখ, স্থলটুকু আমাদের সুখ।''[২৪]

কালকূট কোথাও আবার হাসির তুলনা টেনেছেন, যথা—দুটি হাসির তুলনা—''বলরামের নীরব হাসিতে খুলে যায় প্রাণের বন্ধ দরজা।''[২৫]

অন্যদিকে শ্যামার হাসি যেন—''এই চড়া হাসির লহরে লহরে অনুভূত হয় এক চাপা পড়া বন্দির নিঃশব্দ যন্ত্রণার ছটফটানি।''[২৬]

আবার রামজীদাসী যখন ভস্মচ্ছাদিত জটাজুটধারী মোহান্তকে প্রণাম করে মঞ্চের একধারে গিয়ে বসলেন তখন এই দুজনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কালকূট তুলনা দেন কিছুটা

এইরকম ভাবে—''চাঁদ উঠেছে আকাশে। সুগোল নয়, কানা-ক্ষয়া থালার মতো।" আর রামজীদাসীর তুলনা টেনেছেন—''বালুর বুকে অভ্রকুচির চাপা হাসির ঝিকিমিকি।"[২৭]

কোথাও তিনি উপমা ঠিক নয় চিত্রকল্প এঁকেছেন, যেমন—''এ রূপ শীতল জলরাশির মতো ঢলঢল নয়। শান্ত গভীর জলের বুকে ভাব-পাগলের অবগাহনের ডাক নেই তাতে। একটি অসহ্য দ্যুতি, একটি দুরন্ত দীপশিখা। কাঁপছে আর জ্বলছে ধিকিধিকি।"[২৮]

অন্য কোথাও— ''যন্ত্রসঙ্গীতের এই সুর যেন একটি ছবি। একটি নিখুঁত প্রাকৃতিক দৃশ্য। নিরন্তর তানপুরাধ্বনি যেন ছবির পিছনের বিস্তৃত অসীম নীল আকাশ। কোলে তার একটি রূপের দ্যুতি। রামজীদাসী।"[২৯]

কালকূটের লেখায় কোথাও ঠিক আবার, অলংকার নয় তিনি বাক্যের অর্থ বিস্তারের দ্বারা ভাব পূর্ণ করে দিচ্ছেন অর্থাৎ শব্দের বিস্তৃতির পাশাপাশি চলছে ভাবের বিস্তার। যেমন 'রাস্তা' -শব্দটি। সুরদাস এক অন্ধ ভিখারী বলছে, ''বাবুজী, আপ-কা-রাস্তা ঠিক হ্যায়? ... কোই নহি বতা সক্‌তা কিধর গয়ী সড়ক, কঁহা গয়া রাস্তা। হ্যায় না বাবুজী?"[৩০]

কোথাও তিনি আবার দুটি কাহিনির ক্ষেত্রেও একটি তুলনামূলক রূপকে তুলে ধরেন। যেমন 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'—গল্পে দেখা যায়—একদিকে যেমন সুবীর সুমিতা বিবেকের গল্প তেমনি প্রায় একই রকমভাবে আরেক গল্প গড়ে ওঠে শুভেন্দু-ললিতা-প্রেমবতীকে নিয়ে।

কালকূট রবীন্দ্রনাথের গান ও বাউল গান অনেক ক্ষেত্রেই লেখার ফাঁকে ফাঁকে আনেন। যে কথা মুখে বলা যাচ্ছে না বা স্পষ্ট নয় কিছুটা আবছা, রহস্যময়, ভাবালু-ভাবপূর্ণ স্থানে তিনি ব্যবহার করেছেন। কখনো নিজে গেয়েছেন আবার কখনও তা চরিত্রর মুখে পরিস্ফুট করেছেন।

কয়েকটি রচনা বাদ দিয়ে কালকূট উপন্যাস না লিখেও যেন স্বাধীন বা মুক্ত মনে নিজের কথা বলার জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন। উপন্যাসে যেখানে গল্প চরিত্রকে ভেবে লিখতে হয় সেখানে তিনি কিন্তু এক মুক্ত ঔপন্যাসিক। অর্থাৎ উপন্যাসে যে মুক্তি থাকে না, সেই মুক্তি কালকূটের লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর আঁকা চিত্রগুলি প্রায় খণ্ড চিত্র কিন্তু তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায় সেই খণ্ড চিত্রই আমাদের মনের ভিতরে দাগ কেটে যায়। এই কালজয়ী রচনাগুলির সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র :

১. স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২৫২

২. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৬০

৩. বিচিত্র—অৃতকুম্ভের সন্ধানে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, অষ্টম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩৬৭০

৪. নিবেদন—হিমালয় সমগ্র—জলধর সেন—সম্পাদনা সুবিমল মিশ্র—দে বুক স্টোর/দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ২০০৮

৫. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৬১

৬. স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২৫৪

৭. নির্জন সৈকতে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩৮৪

৮. স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২৮৪-২৮৬

৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৮৬

১০. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৮২

১১. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৬১

১২. পূর্বোক্ত

১৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭২

১৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭৬

১৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৩

১৬. পূর্বোক্ত

১৭. পূর্বোক্ত

১৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৫

১৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৬

২০. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭৫

২১. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮৮

২২. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৬

২৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮৮

২৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৪

২৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮০

২৬. পূর্বোক্ত

২৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৩৮

২৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৩৯

২৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৪৩

৩০. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৮০